শাসনের দ্বিতীয় পর্বে, বিদেশনীতির ব্যর্থতার সময়ে, তৃতীয় নেপোলিয়ন অভ্যন্তরে বোনাপার্টির উদারনীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া, আইনসভাকে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া এরই অঙ্গ ছিল। এমনকি ১৮৬০-এর পর জনসভা ডাকার অধিকারও ফরাসিদের দেওয়া হয়, সেইসঙ্গো শিথিল করা হয় সংবাদপত্রের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ।

৪.৭ তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতি

বোনাপার্টিয় মিথকে আশ্রয় করে ক্ষমতায় এসেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। সেই মিথ-এর একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল সফল চোখ ধাঁধানো বিদেশনীতি। তাই তৃতীয় নেপোলিয়নকেও আন্তর্জাতিক মর্যাদালাভের যোগ্য পররাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করতে হয়, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ফরাসিদের গৌরব-বাসনাকে তৃপ্ত করা। কিন্তু এ ব্যাপারে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির মতো সফল হননি। কারণ কুটনীতি ও সমর-পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম নেপোলিয়নের মতো সাধ থাকলেও সাধ্য তাঁর ছিল না। তাঁর বিদেশ নীতিকে স্পষ্ট দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়। শাসনকালের প্রথম আটবছর (১৮৫২-১৮৬০) ছিল সাফল্যের যুগ, আর বাকি দশবছর ছিল (১৮৬০-১৮৭০) ব্যর্থতার পর্ব।

তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশ নীতির প্রথম সাফল্য এসেছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬)। বলকান অঞ্চলে অটোমান তুর্কীদের অধীনস্থ জাতিগুলির সমর্থনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন। প্রকাশ্যে তিনি জেরুজালেমের পবিত্র চার্চের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দাবি করেন। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল মস্কো অভিযানে প্রথম নেপোলিয়নের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। যুদ্ধে লুই নেপোলিয়ন সফল হয়েছিলেন। সন্ধির স্থান হিসেবে প্যারিসকেই সকলে বেছে নেন, ফলে ফ্রান্স আবার ইউরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরে আসে। প্যারিসের চুক্তিতে মোলাডাভিয়া ও ওয়ালাসিয়ার সংযুক্তি করে রুমানিয়ার উদ্ভবের প্রস্তাবে সায় দিয়ে তিনি জাতীয়তাবাদের সমর্থক হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও ফরাসিদের কৃতজ্ঞতা লাভ করেন।

এর চাইতেও বেশি কৃতিত্ব তৃতীয় নেপোলিয়ন অর্জন করেন ইতালিতে। ইতালির জাতীয় ঐক্যের আন্দোলন তিনি সমর্থন করতেন। ১৮১৫ সালের গ্লানি মুছে ফেলার এটা ছিল একটা উপায়। তিনি ভেবেছিলেন, অস্ট্রিয়ার আধিপত্য থেকে ইতালির মুক্তির লড়াইয়ে ফ্রান্স সাহায্য করলে, মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ ইতালির ওপর ফ্রান্সের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার মন্ত্রী কাউন্ট ক্যাভুরের সঙ্গো প্লমবিয়ার্সের চুক্তি করেছিলেন। ক্যাভুরকে সম্রাট এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, অস্ট্রিয়ার সঙ্গো আসন্ন যুদ্ধে তিনি ইতালিয়দের সাহায্য করবেন। ফরাসি সাহায্যে পুস্ট হয়েই ক্যাভুর 'ম্যাজেন্টা' ও 'সলফেরিনো'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে হারিয়েছিলেন। চারদিকে তখন ফ্রান্সের জয় জয়কার। কিন্তু ইতিমধ্যে পোপের রাজ্যের ভবিষ্যতে অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় গোঁড়া ফরাসি ক্যাথলিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে দেখে তৃতীয় নেপোলিয়ন চুক্তি থেকে সরে আসেন। তাছাড়া প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সমর্থনে রাইন অঞ্চলে সেনা পাঠানোয় ফরাসি বাহিনীর সাফল্যও নিশ্চিত ছিল না। তাই তৃতীয় নেপোলিয়ন কূটনৈতিক পটবদলের আশ্রয় নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গো করেছিলেন ভিল্লফ্রাঙ্কার সন্ধি। অবশ্য টাস্কানি, মডেনা এবং রোমাগনা যাতে সার্ডিনিয়ার সঙ্গো মিলে যেতে পারে, তার জন্য তিনি ক্যাভুরকে আগের মতোই

সাহায্য করেছিলেন, বিনিময়ে ১৮৬০-এ ক্যাভুর ফ্রান্সকে দিয়েছিলেন স্যাভয় এবং নিস। এভাবে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা চুক্তির একটি গ্লানিময় শর্ত থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ান।

কিন্তু এরপরেই শুরু হয়েছিল নেপোলিয়নের ব্যর্থতার পর্ব। ক্রিমিয়া এবং ইতালি-এই দুটি যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্সের অর্থনীতি অল্প হলেও ঘা খেয়েছিল। ব্রিটেনের সঙ্গে কবডেনের চুক্তি করে (১৮৬০) সম্রাট একদিকে শক্তির বাণী আর অন্যদিকে উদার বাণিজ্যনীতির সুফল ছড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাইরের সামরিক অশান্তি তাঁর পিছু ছাড়েনি। ১৮৬৩ সালে রাশিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পোল্যান্ড ফ্রান্সের কাছে সাহায্য চায়। নেপোলিয়ন বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করে রুশ জার-এর কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠান। কিন্তু জার ফ্রান্সের প্রতিবাদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তৃতীয় নেপোলিয়নের মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেন। নৃশংসতার সঙ্গে তিনি পোল্যান্ডের বিদ্রোহ দমন করেন। নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়নের আর কিছু করার ছিল না।

সম্রাটের পরবর্তী ব্যর্থতার ক্ষেত্র ছিল মেক্সিকো। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সুযোগে মেক্সিকোর প্রজাতন্ত্র নষ্ট করে তিনি ১৮৬৪ সালে তার কাংবদ ম্যাক্সিমিলিয়ঁকে মেক্সিকোর সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের শেষে আমেরিকার চাপে তিনি মেক্সিকো থেকে ফরাসি সেনা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অসহায় ম্যাক্সিমিলিয়ঁকে মেক্সিকোর শাসকগোষ্ঠী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায় কূটনৈতিক-সামরিক গ্লানির দায়ভার নিতে হয়েছিল তৃতীয় নেপোলিয়নকে। এমনকি চীনে ফরাসি ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় বা কোচিন-চীন দখল করার গৌরবও এই ব্যর্থতার মুখে ম্লান হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতেই ১৮৬৬ সালে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ফ্রান্সের বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিকে আশঙ্কার চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের ধারণা ছিল অন্যরকম। প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের কূটনৈতিক আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, অস্ট্রিয়াকে আঘাত করাই প্রাশিয়ার মূল লক্ষ্য, ফ্রান্সের সঙ্গে সে কখনোই শত্রুতা করবে না। তৃতীয় নেপোলিয়ন তখন ভিয়েনা-ব্যবস্থার পরিবর্তন, অস্ট্রিয়ার পরাজয়—এই জাতীয় স্বপ্নে মগ্ন। প্রাশিয়াকে তিনি 'জেনার'—(Jena) যুদ্ধে (প্রথম নেপোলিয়নের সময়ে) ফ্রান্সের হাতে পরাজিত একটি রাষ্ট্র হিসেবেই দেখেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের বুঝতে ভুল হয়েছিল। বিসমার্কের কূটনীতির কাছে তিনি পরাস্ত হয়েছিলেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রাশিয়া ফ্রান্সের সীমানায় একটি প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের সূচনা করায় ফরাসীদের মর্যদা ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের করার কিছু রইল না। বরং প্রাশিয়ার কাছে কিছু ভূখণ্ড ও অর্থ দাবি করে তিনি পরধনলোভী বলে নিন্দিত হলেন। ইংল্যান্ড ও অন্যান্য জার্মান রাজ্য তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল।

এরপরেই প্রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছিল। ফ্রান্সকে না হারিয়ে বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলোর ওপর আধিপত্য নিশ্চিত করতে পারছিলেন না বলেই তাঁর পক্ষে এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্পেনের রাজসিংহাসনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রাশিয়ার রাজবংশের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে ফ্রান্স থেকে যে অনুরোধ প্রাশিয়ায় গিয়েছিল সে অনুরোধ প্রাশিয়ার রাজা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং 'এমস্' থেকে টেলিগ্রাম করে খবরটা বিসমার্ককে জানিয়েছিলেন। সেই টেলিগ্রামটি চতুর বিসমার্ক এমনভাবে কাগজে ছাপিয়েছিলেন এবং

প্রাশিয়ারাজের প্রত্যাখ্যানপর্ব এমনভাবে বর্ণনা করেছিলেন, যাতে ফ্রান্স খুবই অপমানিত বোধ করে এবং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেয়। ঘটনাক্রম বিসমার্কের পথেই গড়ায়, পরিস্থিতির ওপর তৃতীয় নেপোলিয়ন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং ঐ 'এমস্ টেলিগ্রামের' প্রতিক্রিয়ায় ১৮৭০-এর ১৯ জুলাই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। এই যুদ্ধই ছিল তাঁর শেষ যুদ্ধ। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্স শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়, তৃতীয় নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে যান, সেই সঙ্গে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

সামরিক ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজে সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিলেন, একথা বলা যাবে না। সামরিক কমিশন গঠন করে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ করতে তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু সামরিক খাতে অর্থব্যয় করতে বাধা দিয়েছিল আইনসভার প্রজাতান্ত্রিক সদস্যরা। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক উদারীকরণের কথা ঘোষণা করায় এই বিরোধিতাকেও তৃতীয় নেপোলিয়ন অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ফলে একদিকে অভ্যন্তরীণ উদারতা আর অন্যদিকে বৈদেশিক মর্যাদা-প্রয়াস—এই দুই-এর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তার অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছিল। গ্রেনভিল ঠিকই মন্তব্য করেছেন, "Nepoleon's efforts to move away from autocracy to the Liberal Empire which strengthened the regime at home came fatally to weaken aborad"।

তবে কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত দায় অবশ্যই ছিল। পোল্যান্ডের ঘটনায় তিনি রাশিয়াকে শত্রু করেছিলেন, ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি করে চটিয়েছিলেন ক্যাভুরকে, অস্ট্রো-প্রাশিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষ থেকে অস্ট্রিয়ার বৈরিতা ডেকে এনেছিলেন, আবার যুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ চেয়ে ক্ষুব্ধ করেছিলেন ইংল্যান্ড ও জার্মান রাজ্যগুলোকে, এদিকে প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর সম্ভাবনা তো ছিলই না। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে তৃতীয় নেপোলিয়নের কূটনৈতিক ভ্রান্তির মূল্য দিতে হয়েছিল ফ্রান্সকে। ফ্রান্স ইউরোপীয় চালচিত্রে মিত্রহীন একঘরে হয়ে পড়েছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ নীতিতে তৃতীয় নেপোলিয়ন যতটা সফল, বিদেশনীতিতে তিনি ততটাই ব্যর্থ। ডেভিড টমসনের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে যথাযথ, "The Second Empire, judged in terms of military glory or original achievement, was indeed only a pale shadow of the First (Empire).

৪.৮ তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ হিসেবে অনেকে তাঁর বিদেশনীতির ব্যর্থতাকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন। কিন্তু সেডানের যুদ্ধ তাঁর অপসারণ ত্বরান্বিত করে থাকলেও সেটা পতনের প্রধান কারণ নয়। যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমা সঙ্কুচিত হয়নি বা প্রাশিয়া ফ্রান্সের প্রশাসনিক কাঠামোয় হস্তক্ষেপ করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর যদি রাশিয়ার জার-এর পতন না হয়ে থাকে, তাহলে সেডানের যুদ্ধের পরই বা কেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে!

আসলে দেশের ভেতরেও, যুক্তিনিষ্ঠ জনমুখী শাসন চালানো সত্ত্বেও, তৃতীয় নেপোলিয়নের সমর্থনের দুর্গে ধস নেমেছিল। একই সঙ্গে অনেক শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ফলে শেষ পর্যন্ত কোন শ্রেণীই সন্তুষ্ট থাকেনি। প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ করে প্রজাতন্ত্রীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, আবার দ্বিতীয় ধাপে উদারীকরণ করে কট্টর কেন্দ্রপন্থীদের অসন্তুষ্ট করেছিলেন। চার্চের পৃষ্ঠপোষণা করে বিপ্লবের উত্তরসূরীদের বিরক্ত করেছিলেন,

আবার ইতালির জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করে ক্যাথলিকদের সমর্থন হারিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুযোগে বুর্জোয়াদের একচেটিয়া হওয়ায় শ্রমজীবীরা ক্ষুব্ধ ছিল, আবার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্বীকৃতি পাওয়ায় মালিকগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এই সামগ্রিক অসন্তুষ্টির ধাক্কা সামলানো সেডানের পরাজয়ের পর আর সম্ভব ছিল না। তাই তৃতীয় নেপোলিয়নকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল।

তাছাড়া ১৮৬০-এর পর ফ্রান্সের অভ্যন্তরে যখন তৃতীয় নেপোলিয়ন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন এবং সংবাদ মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেছিলেন, সেই সময় ল্য সিয়েকল্ (Le Siecla) প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকার পাতায় প্রজাতন্ত্রী নেতারা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। তিয়ের (Thiers)-এর মতো মধ্যপন্থী এবং গাঁবেত্তার মতো চরমপন্থী—সকলেরই সমালোচনার লক্ষ্য ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। আর এক সমালোচক ছিলেন ভিক্টর হুগো (Victor Hugo), যিনি নির্বাসনে বসে লিখেছিলেন 'পানিশমেন্ট' গ্রন্থটি। 'থ্রি জুল্স্' বলে চিহ্নিত তিন আইনজীবী জুল্স্ ফেরী, জুল্স্ সিম এর জুল্স্ ফারর তৃতীয় নেপোলিয়নকে প্রায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এর ওপর ছিল বামপন্থী সমাজতন্ত্রীরা। এই প্রতিরোধ-এর সামনে এমনিতেই তৃতীয় নেপোলিয়ন অসহায় বোধ করছিলেন। সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাই তিনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

৪.৯ তৃতীয় নেপোলিয়ন : একটি মূল্যায়ন

শেষ বিচারে তৃতীয় নেপোলিয়ন একজন ব্যর্থ সম্রাট। তাই নানা সমালোচনা তাঁকে বিদ্ধ করেছে। রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে মর্যাদা দিলেও কিংলেক বলেছেন রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত, কার্ল মার্ক্স বলেছেন নির্বোধ আর ভিক্টর হুগো ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন'। সিম্যান তাকে বলেন দ্বিধাগ্রস্ত এবং অস্থিরচিত্ত। "......his lack of ability to come to a clearcut decision about anything is the most pronounced feature of his character."

কিন্তু এতটা সমালোচনা বোধহয় তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রাপ্য নয়। অর্থনীতি ও সমাজনীতির দিক থেকে ফ্রান্সের জন্য যেসব পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন, তা ১৭৮৯-এর বিপ্লব ও প্রথম নেপোলিয়নের পর আর কখনো নেওয়া হয়নি। এই পদক্ষেপগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন ডেভিড টমসন, "it has considerable importance for the material development of France and for the shaping of modern Europe." কিন্তু তবুও তৃতীয় নেপোলিয়নকে অনেক সময়েই দুরভিসন্ধির মানুষ বলে মনে হয়েছে। আসলে ঐতিহাসিক লিপসনই ঠিক বলেছেন যে, বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও অব্যবস্থিতচিত্ত তৃতীয় নেপোলিয়ন কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের জালে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই জাল কেটে তিনি বেরোতে পারেননি। তাই তিনি পরাজিত রাষ্ট্রনায়ক।

৪.১০ তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্যারি কমিউনের বিদ্রোহ

সেডানের যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। সাময়িকভাবে জুল সিম (Jules Simon) ও জুল ফাবর-এর (Jules Fabra) নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থী প্রজাতন্ত্রী

গোষ্ঠী এবং লিয়ঁ গাঁবেত্তার (Leon Gambetta) চরমপন্থী গোষ্ঠী যৌথভাবে ওতেল দ্য ভিল (Hotel de ville) থেকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। লুই জুল ত্রশু-র (Louis Jules Trochu) নেতৃত্বে স্থাপিত হয় জাতীয় আত্মরক্ষার সরকার। ১৮৭১-এর ২৮ জানুয়ারি এই সরকার ভার্সাই-এর আরশি-মহলে (Hall of Mirrors) বিসমার্ক-এর সঙ্গে চুক্তি করে ফ্রান্সের পরাজয় মেনে নেয়। এরপর সীমিত নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্রান্সে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় এবং তার ভিত্তিতে তিয়ের-এর নেতৃত্বে যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, তারা ১ মার্চ ফ্রাংকফুর্টের সন্ধিতে জার্মানির হাতে ফ্রান্সের চরম অবমাননা মেনে নেয়। কিন্তু জার্মান সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ প্যারিসের শ্রমজীবী জনতা প্রজাতন্ত্র সরকারের বৈধতা মেনে নিতে অস্বীকার করে। শুরু হয় গৃহবিরোধ। তারই পরিণতিতে প্যারিস শহরে একটি বিদ্রোহী শাসন-সংস্থা বা শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এটাই প্যারি কমিউন নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

৪.১১ প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠা ছিল ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের বুর্জোয়া বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি। ১৮৩০-এর দশক থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল এর বাস্তব প্রেক্ষাপট। লুই ফিলিপের রাজত্বকাল (১৮৩০-১৮৪৮) সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় ক্রমশ প্রভাবিত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সমৃদ্ধ ছিল। ১৮৩১ সালে লিয়ঁর এবং ১৮৩৯ ও ১৮৪০ সালে পারির অভ্যুত্থান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮৪৮ সালের বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রথমদিকে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা লুই ফিলিপের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের দলে শ্রমিকদের নিয়ে নেয়। কিন্তু সশস্ত্র শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করে লুই নেপোলিয়ন বা তৃতীয় নেপোলিয়নকে সরকারি ক্ষমতা দখল করতে সাহায্য করে। এইভাবে ১৮৫২ সালে জন্ম হয় 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের'।

'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে'র আমলে ফ্রান্সের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি খুব দ্রুত হয়। ওখানকার পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধিও খুব উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে ১৮৪৮ সালের দমন ও সামরিক পরাজয় সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীকে স্তব্ধ করা সম্ভব হয় নি। মজুরি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক দাবির জন্য তাদের সংগ্রাম ক্রমেই প্রসার লাভ করে। পুলিশ, আদালত, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি পীড়নের যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ফ্রান্সে ধর্মঘট বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৬৮ সালে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনের প্রসারও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৬৪ সালে ইতিমধ্যে স্বয়ং মার্কসের নেতৃত্বে সার্বজাতিক শ্রমিকসংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার প্রভাব ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও বাড়তে থাকে।

'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য' ফ্রান্সের উগ্র জাতীয়তাবাদে পুরোপুরি ইন্ধন যোগায় এবং 'প্রথম সাম্রাজ্যে'র (প্রথম নেপোলিয়নের অধীনে) সীমানা পুনরুদ্ধারের দাবি ওখানকার শাসকশ্রেণী তুলে ধরে। অর্থাৎ রাইন্ নদীর বাম তীরে জার্মানির অধীনে থাকা ভূমির জন্য দাবি করা হয়। স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার রাজপুত্রের যে দাবি ছিল সে দাবি ইউরোপীয় ভারসাম্যের ক্ষতিকারক এই অছিলায় ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৮৭০ সালের ১৯ জুলাই।

যুদ্ধ ঘোষণার চারদিন পর 'সার্বজাতিক শ্রমিকসংস্থার সাধারণ পরিষদের প্রথম অভিভাষণে' শাসকশ্রেণীর যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকশ্রেণীর সার্বজাতিক কর্তব্যের কথা মার্ক্স মনে করিয়ে দেন পরিষদের সভ্যদের। মার্ক্সের

‘প্রথম অভিভাষণের’ পূর্বেই ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকেরা তাদের সার্বজাতিক কর্তব্য পালন করতে শুরু করে দিয়েছিল। যুদ্ধ আরম্ভের প্রায় একটা সপ্তাহ পূর্ব থেকে উভয়দেশের শ্রমিকসংস্থাগুলি—বিশেষত নব প্রতিষ্ঠিত সার্বজাতিক শ্রমিকসংস্থার শাখাগুলি—প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিল যে এ যুদ্ধ শাসকশ্রেণীর যুদ্ধ, এ যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। একদেশের শ্রমিকের সঙ্গে অপর দেশের শ্রমিকের কোনো শত্রুতা থাকতে পারে না, তারা পরস্পরের বন্ধু এবং বর্তমান যুদ্ধ এই বন্ধুত্বকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণীর ষড়যন্ত্র।

শ্রমিকশ্রেণীর তখনকার আপেক্ষিক শক্তির পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। ফ্রান্সের পক্ষে এ যুদ্ধের ফলাফল সর্বনাশ হয়ে দেখা দেয়। সেপ্টেম্বরের দুই তারিখে ফরাসি সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্ষমতাচ্যুত হন। চার তারিখে ‘দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে’র ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে প্যারিসের শ্রমিকরা সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে। অন্যদিকে এক তথাকথিত ‘জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার’ গঠিত হয়। এই সরকারের সভ্যরা ছিল অংশত রাজতন্ত্রী অংশত সাধারণতন্ত্রী এবং এদের মধ্যে রাজতন্ত্রীদের হাতে ছিল পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী। যে সময় প্যারিসের দিকে প্রাশিয়ার সৈন্যরা এগিয়ে এসেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব নেতৃবৃন্দ সরকারি জেলখানায় বন্দী সে সময় শ্রমিকেরা এই ব্যবস্থা মেনে নেয় শুধু একটি শর্তে যে নব প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে বাঁচাবার লড়াই চালিয়ে যাবে। জার্মানদের দিক থেকে এই যুদ্ধ আর আত্মরক্ষার যুদ্ধ ছিল না। পরিণত হয়েছিল আক্রমণাত্মক যুদ্ধে।

ইতিমধ্যে প্যারিসের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য অস্ত্রধারণক্ষম সমস্ত নাগরিককে সশস্ত্র করা হয় এবং তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে ‘জাতীয় রক্ষী বাহিনী’ যার মধ্যে শ্রমিকেরা ছিল সংখ্যাগুরু। তথাকথিত ‘জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার’ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে কেননা তারা বুঝতে পারে যে প্রাশিয়ার আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ফরাসি শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের অর্থ ছিল ফরাসি বিত্তবানদের বিরুদ্ধে ফরাসি শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ। ‘জাতীয় কর্তব্য এবং শ্রেণীস্বার্থের এই সংঘাতে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে পরিণত হয় জাতীয় প্রতারণার সরকারে।’ পরবর্তীকালে বিভিন্ন দলিল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই সরকার প্রথম থেকেই প্যারিসের আত্মসমর্পণের বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

নতুন সরকারের প্রথম কাজ ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা। তারা দাবি করে যে প্যারিসীয় রক্ষীবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং যুদ্ধাবসানে রক্ষীবাহিনীর সেগুলিকে রাখার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু এই দাবি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রক্ষীবাহিনীর লোকেরা নিজেরা চাঁদা তুলে ঐ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিল এবং ২৮ জানুয়ারির আত্মসমর্পণের চুক্তিতে যেসব সরকারি অস্ত্রশস্ত্র প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার কথা হয় তার থেকে রক্ষীবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৮ মার্চ তিয়ের তার সেনাপতির অধীনে এক সৈন্যবাহিনী পাঠায় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে কামান দখল করার জন্য। সেই থেকেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। অবশ্য রক্ষীবাহিনীর প্রতিরোধ এবং তাদের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহারের জন্য তিয়েরের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তিয়ের তার অনুচরদের নিয়ে পালিয়ে যান ভের্সাইয়ে। বিপ্লবীরা প্যারিসের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি অস্থায়ী সরকারে পরিণত হন।

২৬ মার্চ প্যারিসে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন হয়। ২৮ মার্চ ঘোষিত হয় কমিউন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি তার সমস্ত ক্ষমতা কমিউনের হাতে তুলে দেয়।

৪.১২ প্যারী কমিউনের চরিত্র ও কার্যাবলী

ইউরোপের মধ্যযুগীয় কমিউন এবং ফ্রান্সের ১৭৯০-এর দশকের কমিউনের সঙ্গো ১৮৭১-এর কমিউনের কিছু আপাতসাদৃশ্য থাকলেও মূলে কিন্তু এদের মধ্যে কোন মিলই ছিল না। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সদ্য আবির্ভূত বুর্জোয়াশ্রেণীর লড়াই-এ মধ্যযুগীয় কমিউন হাতিয়ারের ভূমিকা নিয়েছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তীকালে এই কমিউনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতার ভিত্তি, যাকে ধ্বংস করা ছিল ১৮৭১-এর কমিউনের একটি প্রধান কাজ। আগের কমিউনের কাজ ছিল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকে বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রতে পরিণত করা, কিন্তু এই কমিউন কখনই রাষ্ট্রক্ষমতা ধ্বংসের কথা ভাবেনি। কিন্তু পুরনো রাষ্ট্র-যন্ত্র অর্থাৎ তার সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আইন এবং আমলাতন্ত্র যে বিত্তবানদের হাতে বিত্তহীনদের শোষণযন্ত্র হিসাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ১৮৭১-এর কমিউন প্রথম থেকেই সচেতন ছিল এবং এই কারণেই সে চেয়েছিল পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের উত্তরাধিকারী না হয়ে তাকে ধ্বংস করতে। পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার সঙ্গো সঙ্গো কমিউনকে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকেই এমন এক গোষ্ঠী বেরিয়ে না আসে যারা পুরনো শোষণ-যন্ত্রের জায়গায় নতুন এক শোষণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে। এই দ্বৈত কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিউন প্রথমেই কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় দাঁড় করায় সশস্ত্র জনগণকে। আইন, শিক্ষা এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদের জন্যই জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন প্রথা চালু করা হয় এবং স্থির করা হয় যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচকরা যে কোনো সময় ডেকে পাঠিয়ে পদচ্যুত করতে পারেন। কমিউনের সভ্য থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পদাধিকারীকে বেতন দেওয়া হয় সাধারণ শ্রমিকের গড়পড়তা মজুরির হারে। শ্রমিকশ্রেণীর আর একটি বৈশিষ্ট্যও—সার্বজাতিকতা—প্রথম থেকে কমিউনের কাজে প্রকাশ পায়। ফরাসি এবং বিদেশীদের মধ্যেকার রাজনৈতিক পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে কমিউন এদের সমান রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে। বস্তুত কমিউনসভ্য এবং শ্রমমন্ত্রী ছিলেন এক হাঙ্গোরীয় এবং তার প্রথম সারির সেনাপতিদের মধ্যে ছিল দুইজন পোলদেশীয়।

রাজনৈতিক দিক ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কমিউন সমভাবে বিপ্লবী ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় এবং ধর্মীয় সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করে ধর্মযাজকদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের যার যার ব্যক্তিগত জীবনে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্ম এবং রাষ্ট্র এই উভয়ের আওতা থেকে মুক্ত করার পর সেখানে জনসাধারণের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। রুটি তৈরির কারখানায় রাত্রির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের উপর মালিকের জরিমানা বসানো নিষিদ্ধ করা হয় এবং বন্ধ কলকারখানা শ্রমিক সমবায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে প্যারিসীয় আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্র স্পষ্ট ফুটে ওঠে। শ্রমিকরা বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কমিউনে অংশগ্রহণ করার ফলে কমিউনের সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রলেতারীয় রূপ গ্রহণ করে।

৪.১৩ প্যারি কমিউনের পতনের কারণ

কিন্তু বিপুল আশা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও কমিউন স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ৭২ দিন, তিয়েরের (Thiers) বুর্জোয়া সরকারের হাতে এর পতন ঘটেছিল ২৮ মে। স্বভাবতই শ্রমজীবী শ্রেণীর এই

অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা কেন অত অল্পদিনের মধ্যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, ইতিহাসবিদ্‌দের কাছে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

প্যারিসে কমিউনের দ্রুত পতনের কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকেরা প্রথমেই যে বিষয়টির উল্লেখ করেন, তা হল প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্বের ভাগবাঁটোয়ারায় কমিউনের অন্তর্বিরোধ। কমিউন প্রতিষ্ঠার পর পরই নবগঠিত পরিষদের ওপর প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে রক্ষীবাহিনীর সেন্ট্রাল কমিটি রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসার কথা ঘোষণা করেছিল। তারা আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা সবসময়েই কমিউন পরিষদের প্রতি অনুগত থাকবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পরিষদকে অগ্রাহ্য করে সেন্ট্রাল কমিটি সাধারণ ঘোষণা (Public Proclamations) জারি করছে, সামরিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে এবং বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনের নিম্নস্তরেও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করছে। সেন্ট্রাল কমিটির এই ধরনের আচরণের ফলে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কমিউন-পরিষদ পুরো প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের কোনো সুযোগই পায়নি।

প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের পরও পরিষদ পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের উত্তরাধিকার অস্বীকার করতে চেয়েও বিচার ও শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে পুরনো কাঠামোই বজায় রাখে। ফলে বিপ্লবী মূল্যবোধ ও চেতনা সৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। যদিও কারখানার রাত্রিকালীন শ্রমব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিলোপ ও সশস্ত্র নাগরিকদের দ্বারা তার স্থানপূরণ, সরকার থেকে ধর্ম ও চার্চের পৃথকীকরণ, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি, বন্ধকী প্রতিষ্ঠানসমূহের অপসারণ, বন্ধ কলকারখানা প্রাক্তন শ্রমিকদের সমবায় সমিতির দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় নিয়োগকেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মে নিযুক্তি—ইত্যাদি কতকগুলো সংস্কার কমিউন করেছিল। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন আনবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কেন কমিউন পরিষদ যথেষ্ট মৌলিক সংস্কারে ব্যর্থ হয়েছিল—এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে দুটো প্রধান কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত প্যারি কমিউন কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ ও সুসংহত নেতৃত্বের অধীনে ছিল না। কমিউন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চার্লস দেলেস-ক্লুজ্ (Charles Delescluze) এবং ফেলিক্স প্যাটের (Felix Pyat) এর মত জ্যাকোবিনরা, সেঁ সিমঁ (St. Simon) এবং ফুরিয়েরের (Fourier) অনুগামী সমাজতন্ত্রীরা, লুই ব্লাঁ (Blanc) স্বয়ং এবং প্রুধোঁর (Proudhon) শিষ্যরা। এছাড়ও ছিলেন লিও ফ্র্যাংকেল (Franckel) এবং এদুয়ার ভেইয়াঁর (Eduard Villant) মত মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা। স্বাভাবিকভাবেই উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে এদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল অনিবার্য এবং এরই ফলে কমিউন নেতৃত্ব কোনো সুচিন্তিত সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কমিউন নেতৃত্বের বিপ্লবী চেতনাও তখনো পর্যন্ত খুব একটা স্বচ্ছ ছিল না। তারা বুঝতে পারেনি যে, প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রতন্ত্র সরাসরি দখল করে তারপর তা পুরোপুরি অস্বীকার করা বা বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো তারা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেও সফল হয়নি এবং এটাও ছিল কমিউনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার একটা অন্যতম কারণ।

সংস্কার পরিকল্পনার ব্যর্থতা, পরিচালন-পরিষদের অন্তর্বিরোধ পরস্পরবিরোধী বক্তৃতা ও অর্থহীন আইন প্রণয়নে কালক্ষেপ ইত্যাদি কারণে কমিউন ক্রমশই সাধারণ জনমানসে অপ্রিয় হয়ে পড়ে। ১৬ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত

সম্পূরক নির্বাচনে (Supplementary election) সীমিত সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ থেকেই সাধারণ মানুষের কমিউন পরিষদ সম্পর্কে হতাশার ছবি স্পষ্ট হয়ে যায়। মোট বিধিবদ্ধ নির্বাচনকারীদের মাত্র ১২% শতাংশ এই নির্বাচনে ভোট দেয় এবং ৩১টি শূন্য আসনের মধ্যে মাত্র ২১টি আসনে প্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব হয়।

একদিকে যখন খোদ প্যারিস শহরেই কমিউন জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে, অন্যদিকে তখন কমিউন নেতৃত্ব ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশ বা শহরের সমর্থন আদায়েও ব্যর্থ হয়। ৬ এপ্রিল কমিউনের পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি ঘোষণার মাধ্যমে—"কমিউন শুধু একটি সংকীর্ণ স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে",—ভার্সাই সরকারের এই জাতীয় বিবৃতির বিরোধিতা করে কমিউন সম্পর্কে সত্য প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে কর্মীদের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হয়। ১৯ এপ্রিল কমিউন "Declaration of the French people" নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে কমিউনের নিজস্ব সাংগঠনিক চরিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় "প্যারিস সংগ্রাম করছে গোটা ফ্রান্সের জন্য। এর ত্যাগ তিতিক্ষা ও লড়াই-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল গোটা ফ্রান্সের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়ন।" প্রতিবেদনের শেষ অংশে ফ্রান্সের জনগণের উদ্দেশ্যে 'ভার্সাইকে নিরস্ত্র ও পরাজিত করার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু এইসব প্রচেস্টা সত্ত্বেও ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশ বা শহর প্যারি কমিউনকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়নি বা ১৫ই মে সশস্ত্র লড়াই-এর জন্য তার আবেদনেও কোনো সাড়া দেয়নি। কমিউন ক্রমশই ফ্রান্সের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রামীণ কৃষকসমাজের সঙ্গেও তার কোনো মৈত্রী স্থাপিত হয়নি। এই ব্যাপক গণসমর্থনের অভাবই তাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তোলে।

সংগঠনের চরমতম সংকটের সময়েও কমিউন নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। ১৬ই এপ্রিলের নির্বাচনের পর প্রধানত জ্যাকোবিন গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং তারা সংখ্যালঘু নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিউন পরিষদ কার্যত অকর্মণ্য হয়ে যায় এবং নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ "Committe of public Safety" নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। সংখ্যালঘু অংশ প্রকাশ্যে এর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে এবং পরিষদের সভায় যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইতিমধ্যে ভার্সাই বাহিনীর হাতে গুরুত্বপূর্ণ ইজি (Issy) দুর্গের পতন ঘটে এবং এই সময়ে "কমিটি অব পাবলিক সেফ্‌টি" ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের তীব্র মতবিরোধ ও পারস্পরিক দোষারোপের প্রবণতা কমিউনকে দ্রুত পতনের পথে নিয়ে যায়।

কমিউন নেতৃত্বের এই সংকটের ফলে প্যারিসে কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি বা প্যারিসের প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত রণকৌশল নির্ধারণ ও সামরিক প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরিষদে বুঝতে পারেনি যে, ভার্সেইকে অবিলম্বে আক্রমণ করার ওপর কমিউনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। পরিষদ 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স' দখল করেনি, যা হয়তো কমিউনের বিজয়ের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হতে পারত। ফলে তিয়ের সময় পেরেছিলেন তাঁর দুর্বল বাহিনীকে সংহত করার। ১৮ মার্চের জয়ের পর জাতীয় রক্ষী বাহিনী সরকারি পুলিশবাহিনীকে বন্দী ও নিরস্ত্র না করে তাদের ভের্সাইয়ে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। এপ্রিলের শেষ দিক থেকে তিয়ের প্যারিস আক্রমণ করতে শুরু করেন। কিন্তু প্যারিসের রক্ষীবাহিনীর সেনাপতিরা প্রায় দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন বলা যেতে পারে। সুতরাং সরকারী বাহিনী যখন প্যারিস অবরোধ করে, তখন প্যারিসের রক্ষীবাহিনী প্রকৃত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ১৬ই মে প্যারিসের প্রাচীরের একটি অরক্ষিত অংশ দিয়ে সরকারি বাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করে। ২৮ মে প্যারি কমিউনের পুরোপুরি পতন ঘটে।

৪.১৪ কমিউনের তাৎপর্য

কিন্তু এই পরাজয়ই কমিউনের শেষ কথা নয়। কমিউন পরাজিত হলেও যে আদর্শ নিয়ে তার জন্ম হয়েছিল, তা অপরাজিতই থেকে যায়। কমিউন তার স্বল্পকালীন অস্তিত্বে যে শিক্ষা রেখে গিয়েছিল, শ্রমিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার মূল্য ছিল অপরিসীম।

মার্ক্স তাঁর Civil War in France নামক রচনায় প্যারি কমিউনকে কেন্দ্রীকৃত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের প্রোলেতারীয় বিপ্লবের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। ডেভিড টমসন এই মতের সমালোচনা করে কমিউনের প্রোলেতারীয় চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অন্য কোন কোন ঐতিহাসিক প্যারি কমিউনের অতটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন। কমিউনের চরিত্রে অস্বচ্ছতা ও স্ববিরোধী প্রবণতা থাকতেই পারে, কিন্তু তবুও ১৮ই মার্চের বিখ্যাত ঘোষণা কমিউনের আদর্শকে ইতিহাসে অম্লান করে রেখেছে। ঘোষণাটি ছিল : "শাসকশ্রেণীর ব্যর্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মুহূর্তে প্যারিসের সর্বহারা শ্রেণী উপলব্ধি করেছে যে, তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গঠন করার অঙ্গীকার নিয়ে সরকারি ক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে নেওয়ার সময় এসে গেছে।" মূলত প্যারি কমিউন ছিল এই অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব, রণকৌশলের অনভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে কমিউন ভেঙে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তবুও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের বিচারে ইতিহাসে তা আজো বেঁচে আছে। মার্ক্স বলেছিলেন, যা করেছিল তা দিয়ে কমিউনের বিচার না করে যা করতে চেয়েছিল তাই দিয়ে তার বিচার করা উচিত। জে. টি. জোঘিনের (J. T. Joughin) মতে, কমিউনের সত্যিকারের তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে পরবর্তী বিপ্লবের ইতিহাসে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে কমিউন সংগঠিত না হলেও পরবর্তী প্রজন্মের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রস্তুতিতে এর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ফ্রাঁকোয়া গেয়াগেল (Francois Goguel) শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চরমপন্থী ঝোঁকে কমিউনের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, মাসৌ (E.S. Masou) কুড়ি শতকের সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের কাজের মধ্যে কমিউনের তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন এবং ফ্রাঙ্ক জেলিনেক (Frank Jellinek) বিপ্লবীতত্ত্বের প্রসারে কমিউনের প্রকৃত অবদানের সম্মান করেছেন। স্বয়ং লেনিন তাঁর বিপ্লবীতত্ত্ব ও দল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কমিউন থেকে মূল শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলে স্বীকার করে গেছেন।

পরাজয়ের মধ্য দিয়েই কমিউন আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল যে, বিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে যায়নি, সার্থক প্রস্তুতি থাকলে শ্রমজীবীদের আন্দোলন সফল হতে বাধ্য। এই ঐতিহাসিক শিক্ষার মধ্যেই নিহিত ছিল প্যারি কমিউনের প্রকৃত বিজয়।

৪.১৫ সারসংক্ষেপ

১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লবের পর সামরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে যে সব শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে, সেই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লুই বা তৃতীয়

নেপোলিয়ন। অভ্যন্তরীণ শাসনে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তিনি কিন্তু বিদেশ নীতিতে ছিলেন ব্যর্থ। ১৮৭০-এ সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার কাছে হেরে গিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান, সেই সঙ্গে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে। একই সঙ্গে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় তৃতীয় প্রজাতন্ত্র তারা প্যারিসে প্যারি কমিউন। ছ সপ্তাহ পর অবশ্য প্যারি কমিউনের পতন ঘটে এবং তৃতীয় প্রজাতন্ত্র টিকে যায়।

৪.১৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ শাসনকাঠামো কেন্দ্রীভূত ছিল কি? এই শাসনের গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

২। তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতির লক্ষ্য কি ছিল? ঐ লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে ফরাসি সম্রাট ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে দিয়েছিলেন কি?

৩। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি? তার কাজের মূল্যায়ন করুন।

৪। ফ্রান্সে প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।

৫। প্যারি কমিউনের পতন হয়েছিল কেন?

ছোট প্রশ্ন :

১। 'জুন ডেজ' (June Days) বলতে কি বোঝায়?

২। লুই নেপোলিয়নকে তৃতীয় নেপোলিয়ন বলা হত কেন?

৩। তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে বিপুল জনসমর্থনের কারণ কি ছিল?

৪। লুই নেপোলিয়নের 'international showmanship' বলতে কি বোঝায়?

৫। আঠারো শতকের কমিউনের সঙ্গে উনিশ শতকের কমিউনের চারিত্রিক পার্থক্য কি?

৬। প্যারি কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ফরাসি 'জাতীয় সভা'কে মার্ক্স-এঙ্গেলস কিভাবে অভিহিত করতেন?

২। লুই নেপোলিয়নের বংশপরিচয় কি ছিল?

৩। তৃতীয় নেপোলিয়ন কোথায় কোন দুর্গে বন্দী হয়েছিলেন?

৪। 'এমস্ টেলিগ্রাম' কি?

৫। দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের কয়েকটি ঋণদানকারী সংস্থার নাম করুন।

৬। তৃতীয় নেপোলিয়নকে 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন' কে বলেছিলেন?

৭। 'বোনাপার্ট-মিথ' কি?

৮। কবডেন চুক্তি, কাদের মধ্যে কেন সম্পাদিত হয়?

৯। ম্যাক্সিমিলিয়ঁ কে ছিলেন?

৪.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। E. Lipson : Europe in the 19th and 20th Centuries.

২। Stephen Lee : Aspects of European History, 1789-1950.

৩। Alfred Cobban : A History of Modern France, 1799-1945.

৪। David Thomson : France—Empire and Republic.

৫। J. F. Joughin : Paris Commune in French Politics.

একক ৫ ❑ বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের গঠন—ইতালি ও জার্মানি ; পুরনো অস্ট্রিয় ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ ঐক্যবন্ধ ইতালি-সৃষ্টির পটভূমি ও যোশেফ মাৎসিনি

৫.৪ যোসেফ মাৎসিনি

৫.৫ কাউন্ট কভুর

৫.৬ গ্যারিবল্ডি

৫.৭ মূল্যায়ন

৫.৮ বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে জামানির সংগঠন প্রস্তুতি

৫.৯ অটো ফন বিসমার্ক

৫.১০ জার্মান উদারপন্থীদের ভূমিকা

৫.১১ বিসমার্কের "রক্ত ও লৌহ" নীতির প্রয়োগ এবং জার্মান ঐক্য

৫.১২ মূল্যায়ন

৫.১৩ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভাঙন

৫.১৪ তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন

৫.১৫ সারসংক্ষেপ

৫.১৬ অনুশীলনী

৫.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ উদ্দেশ্য

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে একদিকে যে বৃহৎ রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ আর অন্যদিকে যে পুরনো সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই বর্তমান এককের উদ্দেশ্য।

৫.২ প্রস্তাবনা

১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় যখন তৃতীয় ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময়েই ইতালি জার্মানিতে গড়ে ওঠে দুটো বড় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র। আবার এতদিন ধরে টিকে থাকা অস্ট্রো-হাঙ্গেরী হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সাম্রাজ্য আর অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য এই সময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, ভাঙতে শুরু করে। ভাঙা-গড়ার একটি বিবরণ ও বিশ্লেষণের উপস্থাপনা করা হবে বর্তমান এককে।

৫.৩ ঐক্যবদ্ধ ইতালি, সৃষ্টির পটভূমি ও যোশেফ মাৎসিনি

আঠারো শতকের ইউরোপে ইতালি নামে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। এখন যে রাষ্ট্রটি ইতালি নামে পরিচিত, তার উত্তর দিকটিতে শাসন করত অস্ট্রিয়া, দক্ষিণ দিকটিতে ছিলেন ফরাসি বুরবোঁ রাজারা। মধ্যাংশটিতে ছিলেন পোপ। এর মধ্যে শুধু পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া সীমিত স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী ছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মনেও জাতীয় রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা জাগে। এর প্রথম কারণ ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লব ইতালিকে দিয়েছিল 'The inspiring concept of a nation as a comity of nations'। দ্বিতীয় কারণ, নেপোলিয়নের অভিযান। হ্যাপ্‌সবুর্গ ও বুরবোঁদের তাড়িয়ে দিয়ে, সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে, পোপকে ক্ষমতাহীন করে, খণ্ড-বিখণ্ড রাজ্যগুলোকে নেপোলীয়নীয় কাঠামোর মধ্যে এনে ফরাসি সম্রাট ইতালিবাসীদের ঐক্যের স্বাদ দিয়েছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মনে যে ক্রমশ জাতীয়তাবাদী চেতনা অঙ্কুরিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল 'কনসিলিয়েটর' পত্রিকার পাতায়। ঐতিহাসিক শান্টু (Cantu), ত্রজা (Troya) ও ক্যাপ্পানি (Cappani) ভাষাবিদ তোম্মাসিও (Tommacio), ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক দ্য জেগ্‌লিও (Massimo d, Azeglio), সংস্কৃতিজীবী লিওপার্ডি (Leopardi) মানজোনি (Manzoni), বার্চেট (Berchet), সিলভিও পেলিকো (Silvio Pellico), গ্যিস্তি (Guisti)—এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের রচনা আর সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে মানুষকে জাতীয় চেতনায় দীক্ষিত করতে শুরু করেছিলেন। যেসব বুদ্ধিজীবী—ইতালি ছেড়ে প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা সেখান থেকেই উদারনীতি আর জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা প্রচার করেছিলেন।

এইভাবে একদিকে যখন ইতালিয়রা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেই সময়ে তাদের ওপর চেপে বসেছিল ভিয়েনা ব্যবস্থার স্বৈরাচার। ফলে প্রতিবাদী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী গোষ্ঠীর জন্ম হতেও দেরি হয়নি। স্বৈরাচারী মেটারনিখীয় প্রতিবন্ধকতার কারণেই এই গোষ্ঠীগুলো গুপ্ত সমিতির চেহারা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

৫.৪ যোসেফ মাৎসিনি

কার্বোনারি ছিল এই রকমই একটি গোপন সংগঠন। এই সংগঠনেই জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হন যোসেফ মাৎসিনি (Giuseppe Mazzini)। গ্যেটে, বায়রণ, দাতঁর গুণমুগ্ধ রোমান্টিক ভাবাদর্শে আপ্লুত মাৎসিনি ইতালির গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে খুঁজেছিলেন দাঁত ও মাকিয়াভেলির লেখার মধ্যে। উদারনীতি আর জাতীয়তাবাদ

ছিল তাঁর প্রধান আদর্শ। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদ বা মার্ক্সের সমাজতত্ত্ব তাঁর পছন্দ হয়নি। কিন্তু শ্রমজীবীদের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল। সাধারণ মানুষের মুক্তি ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। রোমকে তিনি "Terza Rome" বা তৃতীয় রোম হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। 'প্রথম রোম' ছিল সিজারের, 'দ্বিতীয় রোম' ছিল পোপ-এর 'তৃতীয় রোম' হবে জনতার, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। ধর্মানুভূতি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি ঠিকই। এমনকি একসময়ে 'ধর্মস্থাপনার' জন্যই তিনি পিডমন্টের রাজা চার্লস এ্যালবার্ট বা পোপ নবম পাইয়ুসকেও আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মবোধ বা আত্মিক সাধনা পুরোপুরি ঈশ্বর নির্ভর নয়, তা ছিল ইতালিয়দের আত্মিক নবজন্মের (Risorgimento) প্রয়াস। ১৮২০-র দশকের সংগ্রামের ব্যর্থতায় হতাশ মাৎসিনি মার্সেইতে ১৮৩০-এ 'ইয়ং ইতালি' (Giovine Italia) দল গঠন করেন। দলে দলে যুবক সম্প্রদায় 'ইয়ং ইতালির' সদস্যপদ গ্রহণ করে। তারা কেউ আংশিক সময়ের জন্য কেউবা পুরো সময়ের জন্য মাৎসিনির আদর্শ দেশবাসীর কাছে প্রচার করে। ১৮৩০ সালে পিডমন্টের গণ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে মাৎসিনি দেশবাসীকে বলেন তারা যেন ভবিষ্যতে সমগ্র ইটালি ছাড়া কোন বিচ্ছিন্ন অংশের জন্য আন্দোলন না করেন। মাৎসিনি গভীর ভাবে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করতেন। তাঁর পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের ঐক্যবদ্ধ ইতালি প্রজাতান্ত্রিক ছাড়া অন্য কিছু হবে না। দেশপ্রেম তিনি ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেন। মাৎসিনি শেষ পর্যন্ত সফল হননি। প্রজাতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ ইতালি তিনি দেখে যেতে পারেননি। হয়ত তাঁর অতিরিক্ত ভাবাবেগ, বাস্তব-বিমুখতা এর কারণ ছিল। জ্যাক ড্রজ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন "This great Patriot...had no political genius..."। হবসবম তাঁর সম্পর্কে আরও তীক্ষ্ণভাষী, "The woolly and ineffective self-dramatizer"। কিন্তু এই তিরস্কার নিতান্তই অবাঞ্ছিত। সম্ভবত মাক৪সকে গ্রহণ করেননি বলেই এঁরা রেগে গিয়েছেন, কিন্তু মনে রাখা দরকার, শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন মাৎসিনি আর রেখে গিয়েছিলেন এমন এক ইতালিকে, যে ইতালিতে, তাঁর কথামতো, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের দিনগুলোতে রাজাদের যুদ্ধের শেষ প্রজাদের যুদ্ধের শুরু'। আর তিনি রেখে গিয়েছিলেন তণার মন্ত্রশিষ্য গ্যারিবল্ডিকে। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের ক্ষেত্রপ্রস্তুত করে গিয়েছিলেন মাৎসিনি। এই প্রস্তুতি না থাকলে কাভুর তাঁর কূটনৈতিক খেলায় (diplomatic game) কতটা সফল হতেন, সন্দেহ।

১৮৪৮-র ইতালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অল্প সময়ের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে পোপের নেতৃত্ব নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টাও কারো কারো মধ্যে দেখা গিয়েছিল। মধ্যযুগীয় পোপপন্থী গুয়েলফ (Guelf) ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে রাজানুগতদের বিপরীতে (মধ্যযুগে এদের বলা হত গিবেলিন, (Ghibeline) পাদ্রী জিওবার্টি (Geoberti) পোপকেই জনতার নেতা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এইরকম পরিস্থিতিতে মাৎসিনির অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন পিডমন্টের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট কাভুর (Count Cavour)।

৫.৫ কাউন্ট কাভুর

কাভুর প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন, একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। তবে মাৎসিনির মতো প্রজাতন্ত্রের প্রতি রোমান্টিক আবেগ তিনি দেখাননি। বাস্তববাদী কাভুর প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধ সংসদীয় ইতালি গড়ার কথা বলে

চার্চপন্থী, ইত্যাদি সবার সহযোগিতাই চেয়েছিলেন এবং প্রয়োজনে বিদেশী সাহায্যও নিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অস্ট্রিয়াকে জোর করেই সরাতে হবে, একথা তিনি মনে করতেন এবং এও বিশ্বাস করতেন যে, নেতৃত্ব দিতে হবে পিডমন্টকেই। পিডমন্টকে তাই তিনি আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন ভিয়েনা-ব্যবস্থাকে নষ্ট করবার জন্য ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন উন্মুখ। তাই তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফ্রান্সকে সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে কাভুর তার সম্পাদিত 'ইল রিদর্গিমেন্টো (Il Risorgimento) পত্রিকার মাধ্যমে ইতালির আঞ্চলিক শাসকদের কাছে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৮৪৮ সালে জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতা দেখে কাভুরের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে বিদেশী সাহায্য ছাড়া ইতালির অস্ট্রিয়া-বিরোধিতা সফল হবে না। তাই তিনি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পাওয়ার আশায় একরকম অসঙ্গত ও অনাহূত ভাবেই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার সেনা পাঠান। যুদ্ধে তাঁর সেনারা বীরত্ব প্রদর্শন করায় সন্ধি-আলোচনায় প্যারিসে কাভুর আমন্ত্রণ পান। সেখানে ইতালির জাতীয়তাবাদী চেতনা ও অস্ট্রিয়ার অন্যায় কর্তৃত্বের কথা তিনি বলার সুযোগ পেয়ে যান। বিশেষ করে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আনুকূল্য অর্জিত হয়। ১৮৫৮ সালে ফ্রান্স ও পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হয় প্লমবিয়ার্সের চুক্তি (Compact of Plombiers) চুক্তিটি ছিল অস্ট্রিয়া-বিরোধী। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারলে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া লম্বার্ডি, ভেনিসিয়া, মোডেনা ও পোপ-রাজ্যের কিছুটা নিয়ে উত্তর ইতালিয় রাষ্ট্র গঠিত হবে বলে ঠিক নয়। ফ্রান্স পাবে স্যাভয় এবং নিস। অস্ট্রিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার নিরপেক্ষতাও নিশ্চিত করা হয়। ইংল্যান্ড ফরাসি-বিরোধী হলেও ইতালিয় জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাছাড়া অস্ট্রিয়ার দুর্দশায় প্রাশিয়ারও খুশি হওয়ার কথা। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণতই কাভুরের পক্ষে চলে এসেছিল। প্লমবিয়ার্সের চুক্তি ছিল কাভুরের কূটনৈতিক চাতুর্যের অন্যতম উদাহরণ।

এরপর কাভুর অস্ট্রিয়াকে উত্তেজিত করবার জন্য সীমান্তে ব্যাপক সমরসজ্জা শুরু করেন। অধৈর্য অস্ট্রিয়ারাজ ফ্রানড্ জোসেফ কাভুরের ফাঁদে পা দেন। অস্ট্রিয়া একটি চরমপত্র দিয়ে পিডমন্টকে ভয় দেখালে সেটাই যুদ্ধের অজুহাত হিসেবে গৃহীত হয় এবং যুদ্ধ শুরু করেন। চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স যুদ্ধে যোগ দেয়। পিডমন্ট-ফরাসী যুগ্মবাহিনী ম্যাজেন্টা ও সলফেরিনোর যুদ্ধে জয়ী হয়। লম্বার্ডি থেকে অস্ট্রিয়াকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পার্মা, মোডেনা, ফ্লোরেন্স ও বোলনে বিদ্রোহ শুরু হয়। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ ফ্রান্স যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে 'ভিল্লাফ্রাংকা'-র সন্ধি (১৮৫৯) করে। সম্ভবত, ফ্রান্সের পাশে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ইতালির অভ্যুদয়ের আতঙ্ক, যুদ্ধে অপরিমিত লোকক্ষয় ও ফরাসি ক্যাথলিকদের পোপ-এর প্রতি সমর্থন—এই সব কারণেই তৃতীয় নেপোলিয়ন পিছিয়ে এসেছিলেন। ফ্রান্স চুক্তিভঙ্গ করায় কাভুরের আপত্তি সত্ত্বেও। পিডমন্টরাজ ইম্যানুয়েল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জুরিখের সন্ধি করে যুদ্ধের অবসান ঘটান। সার্ডিনিয়া শুধু লম্বার্ডি পায়, ভেনিসিয়া আগের মতোই অস্ট্রিয়ার অধীনে থেকে যায়।

ইতিমধ্যে পার্মা, মোডেনা, টাস্কেনি প্রভৃতি মধ্য-ইতালির রাজ্যগুলো পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। কাভুর ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস দিয়ে এই সংযুক্তির ব্যাপারে তার সাহায্য নেন। একটি গণভোটের আয়োজন করে সংযুক্তিটিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে রোম বাদ দিয়ে পোপের রাজ্য আমব্রিয়া (Umbria) ও মার্চেস (Marches) কাভুর জয় করে নেন। ঐক্যবদ্ধ হয় উত্তর ও মধ্য ইতালি। বাকি থাকে দক্ষিণ ইতালি।

৫.৬ গ্যারিবল্ডি

দক্ষিণ ইতালির সংযুক্তিকরণে মাৎসিনির শিষ্য গ্যারিবল্ডির 'লাল কুর্তা' বাহিনীর সামরিক অভিযান ও কাভুরের কূটনৈতিক প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী জঙ্গী বিপ্লবী গ্যারিবল্ডি সিসিলি ও নেপল্‌স্ জোর করেই অধিকার করেছিলেন। কিন্তু তা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হওয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রনেতারা আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন গোপনে গ্যারিবল্ডিকে সমর্থন করেও প্রকাশ্যে কাভুর এই কাজের সঙ্গে সার্ডিনিয়ার সম্পর্ক অস্বীকার করেন। আবার তলে তলে ইতালির জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সিসিলি ও নেপস্‌সে জোর প্রচার চালান। ফলে গণভোট করে সিসিলি ও নেপল্‌সের মানুষ কাভুরের ইতালির পক্ষে যোগ দেয়। গণভোটের মাধ্যমে এই সংযুক্তি সম্ভব হয় বলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও আর আপত্তি করেনি।

কিন্তু বিপদ দেখা দেয় যখন গ্যারিবল্ডি রোম অভিযান শুরু করেন। প্রথমত, রোমের প্রহরায় ফরাসি বাহিনী নিযুক্ত ছিল। সুতরাং গ্যারিবল্ডির রোম অভিযান ফরাসি হস্তক্ষেপ নিয়ে এলে ঐক্যের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, গ্যারিবল্ডি কট্টর সাধারণতন্ত্রী হওয়ায় ইতালিতে রাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আশংকা ছিল। কাজেই বাধ্য হয়ে কাভুর আপাতত গ্যারিবল্ডিকে নিরস্ত করতে পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে পাঠিয়েছিলেন। গ্যারিবল্ডি নিজেও বিপদ বুঝতে পেরে ইম্যানুয়েলের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ক্যাপরেরা দ্বীপের কৃষি-খামারে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে যান। উত্তরে ভেনিসিয়া ও মধ্যে রোম ছাড়া বাকি ইতালি ঐক্যবদ্ধ হয়। এই সময়েই মৃত্যু হয় কাভুরের। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার 'সাদোয়া'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে ভেনিসিয়া ইতালিতে যোগ দেয়, আর ১৮৭০ সালে সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে রোম থেকে ফরাসি সেনা সরে যায় এবং রোম ইতালির সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে মাৎসিনি-কাভুর-গ্যারিবল্ডির স্বপ্ন পূর্ণ হয়, ঐক্যবদ্ধ হয় গোটা ইতালি। পিডমন্ট-রাজ ভিক্টর ইম্যানুয়েল ইতালির রাজা হিসেবে স্বীকৃত হন।

৫.৭ মূল্যায়ন

যদিও ইতালির চূড়ান্ত ঐক্য কাভুর দেখে যেতে পারেননি, তবু ইতালির ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানে তাঁর অবদানই ছিল সবাচাইতে বেশি। বাস্তববাদী কূটনীতিবিদ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে, মাৎসিনির আদর্শবাদ আর গ্যারিবল্ডির সামরিক প্রতিভার সমন্বয় সাধন করে তিনি ইতালিকে আধুনিক রাষ্ট্রের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। গ্যারিবল্ডি ছিলেন ইতালির 'রোমান্টিক হিরো'। মাৎসিনির 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলনে দীক্ষিত গ্যারিবল্ডি ১৮৪৮-এ ফরাসি বাহিনীর হাত থেকে রোমানা প্রজাতন্ত্রকে বাঁচিয়েছিলেন, ১৮৫৯-এ লেক কোমো-তে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, আর কালাটাকিমি ও ভলটার্নের যুদ্ধ জিতে সামন্তরাজদের হাত থেকে সিসিলি-নেপ্‌ল্‌সকে উদ্ধার করে কাভুরের পথ মসৃণ করে দিয়েছিলেন। কাভুরের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিল, কিন্তু দুজনেই ছিলেন জাতীয়তাবাদী।

ইতালি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু মাৎসিনির মূল স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল, একথা বলা যাবে না। ইতালির কৃষকরা তখনো জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিল না। কূটনীতি ও যুদ্ধের মাধ্যমে

ইতালির ঐক্য এসেছিল। রেলপথ ছিল না, শিল্প ছিল না, ছিল যুদ্ধের আর্থিক চাপ আর এক রাজার শাসন। সংসদ থাকা সত্ত্বেও সাধারণের অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ জাতীয় রাষ্ট্র আর তার জাতীয় সমরবাহিনী তৈরি হয়েছিল, গড়ে ওঠেনি জাতীয় সমাজ বা জাতীয় মন। সম্ভবত অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে এই কারণেই ইতালিতে সহজে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়েছিল। সুতরাং গ্রেনভিল যখন হতাশার সুরে বলেন, "Cavour saw Mazzini's ideas defeated", তখন সেই হতাশাকে নিরর্থক বলা যায় না।

৫.৮ বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে জার্মানির সংগঠন প্রস্তুতি

উনিশ শতকে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে শুধু ইতালিরই অভ্যুদয় হয়নি, জার্মানিরও হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময় জার্মানীও ছিল একটি 'ভৌগোলিক সংজ্ঞা' মাত্র। প্রায় তিনশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যকে নেপোলিয়ন প্রথমে পনেরোটি অঞ্চলের 'রাইন যুক্তরাজ্যে' (Confederation of the Rhine) পরিণত করেন, জার্মানদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন ঐক্যের স্বপ্ন। কিন্তু ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জার্মানি আবার ঊনচল্লিশটি রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব। জার্মান শাসকবর্গের প্রতিনিধিসভা ডায়েট (Diet)-কে অস্ট্রিয়াই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, জার্মান জাতীয় চেতনা নিষ্পেষিত হতে থাকে মেটারনিখ ব্যবস্থা ও কার্লসবাড ডিক্রির যাঁতাকালে। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে হ্যানোভার, হেসি, স্যাক্সনি প্রভৃতি রাজ্যে আন্দোলন শুরু হয়। মেটারনিখ তৎপরতার সঙ্গে তা দমন করেন।

কিন্তু তবুও ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে যে জাতীয় ঐক্যের চেতনা একটু একটু করে জার্মানদের মনে চারিয়ে যাচ্ছিল, তা সমূলে উৎপাটিত হয়নি। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রগতিশীল চিন্তার ধারা, ফিকটে, হেগেল বা স্টেইনের দর্শন জার্মানিতে নবজাগৃতি নিয়ে গভীর জাতীয় আবেগের জন্ম দেয়। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ঢেউয়ে জার্মান রাজ্যগুলোও আন্দোলিত হয়েছিল। ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনি, হ্যানোভার-এ শাসন-সংস্কারের দাবিতে গণ-আন্দোলন দেখা যায় এবং প্রাশিয়ারাজ চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়মসহ অন্যান্যরা কিছু সংস্কার করতে বাধ্য হন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য গঠিত হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট পালামেন্ট। অবশ্য অচিরেই গণ আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হয়ে আসে। জার্মান রাজ্যগুলোকে এক কাঠামোয় নিয়ে আসার এরফুর্ট প্রস্তাব অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্যোয়ার্জেনবার্গ (Schwarzenberg)-এর বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। ১৮৫০-এর ওলমুজের চুক্তিতে প্রাশিয়া জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য মেনে নেয়। ১৮৬১ সালে প্রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন প্রথম উইলিয়ম, ১৮৬২ সালে তিনি ব্যান্ডেনবার্গের অভিজাত সন্তান রাশিয়ায় প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত অটো ফন বিসমার্ককে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী করে নিয়ে আসেন। শুরু হয় জার্মান জাতীয় রাষ্ট্রগঠন প্রস্তুতির দ্বিতীয় অধ্যায়।

৫.৯ অটো ফন বিসমার্ক

"প্রখর বাস্তববাদী এই ব্যক্তি কোন অসীম উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করতেন না।"—বিসমার্ক সম্পর্কে এই উপলব্ধি গ্রেনভিলের। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। গণতন্ত্র ও সংসদীয় রাজনীতির ওপর তাঁর সামান্যতম আস্থাও ছিল না। তিনি একক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতেন। জার্মান স্বার্থের চাইতেও প্রাশিয়ার স্বার্থ তাঁর

কাছে বড় ছিল। এক জার্মান রাষ্ট্রে প্রাশিয়ার বিলুপ্তি তিনি চাননি। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে এক জার্মান রাষ্ট্র ছিল তার অভীষ্ট। এই সিদ্ধি লাভের জন্য তিনি বিবেকহীন কূটনীতিতেও পিছপা নন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের কাছে প্রাশিয়ার উদ্দেশ্য তাই তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন। ফরাসি সম্রাটকে তিনি একজোট হয়ে ভিয়েনাব্যবস্থা ভেঙে ফেলার লোভ দেখিয়েছিলেন। আবার, অস্ট্রিয়াকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, জার্মান কনফেডারেশন গঠন করে তার ওপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যৌথ কর্তৃত্ব স্থাপিত হোক।

যাই হোক, বিসমার্ক যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাশিয়া সামরিক ও আর্থিক শক্তিতে জার্মানির মধ্যে সবচাইতে অগ্রণী রাষ্ট্র। জার্মান শুল্ক সংঘের নেতা। ১৮১৯ সালে, ভিয়েনা সম্মেলনের পর পরই 'জোলভেরেন' (Zollverein) নামে এই শুল্ক সংঘটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫০ সাল নাগাদ প্রায় সব জার্মান রাজ্যই এই সংঘে যোগ দিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল গোটা জার্মান ভূখণ্ডে এক শুল্কনীতি বা অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠা করা। জোলভেরেন-এর মাধ্যমে জার্মান রাজ্যগুলোর শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই সাধিত হয়নি, অর্থনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিও তৈরি হয়েছিল। এই ভিত্তিটিই শক্ত করতে চেয়েছিলেন বিসমার্ক।

বিসমার্ক বুঝতে পেরেছিলেন, জার্মান ঐক্য প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই আসবে। কিন্তু জনতার ভূমিকা পছন্দ করতেন না বলে, বা ইতিহাসে জনতার গুরুত্ব মানতেন না বলে, আন্দোলনের পথে না হেঁটে কূটনীতি ও যুদ্ধনীতির পথে হাঁটার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন, জাতি তৈরি হয় রাজকর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে প্রাশিয়ার রাজকর্তৃত্ব হবে জার্মান জাতির কেন্দ্র। তার শক্তি জোগাবে অর্থবান জার্মানগোষ্ঠী, আবার ঐ অর্থবান গোষ্ঠীর জন্যই বিসমার্ক এক জাতি এক রাষ্ট্রের বিশাল বাজার নিশ্চিত করবেন। এই নিশ্চিতি অর্জিত হবে সামরিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, অস্ট্রিয়াকে হাটিয়ে, দুর্বল করে আর সব জার্মান রাজ্যকে এক শাসনকর্তৃত্বের শেকলে বেঁধে রেখে। এইভাবেই বিসমার্কের ভাবনায় ও পরিকল্পনায় তত্ত্বস্থ হয়েছিল 'রক্ত ও লৌহে'র যুদ্ধনীতি (Policy of Blood and from)। কিন্তু এই নীতিতে সাধারণ নাগরিকের কোন গুরুত্ব না থাকলেও এর রূপায়ণের স্বার্থে তাদের মৌন সমর্থন জরুরী ছিল। এই সমর্থন বিসমার্ক আদায় করেছিলেন জার্মান উদারপন্থীদের প্রভাব কৌশলে ব্যবহার করে।

৫.১০ জার্মান উদারপন্থীদের ভূমিকা

ফরাসী বিপ্লবের মুক্তপন্থার আদর্শ (Liberalism) জার্মানিতেও ছড়িয়েছিল। জার্মান জাতীয়তাবাদী উদারপন্থীরা একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র চেয়েছিলেন। জার্মান জনতার সমর্থন তাদের দিকেই ছিল। এই উদারপন্থীরা কর্তৃত্ববাদ ও সমরবাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১৮৪৮-এর গণ আন্দোলনের ব্যর্থতা তাদের হতোদ্যম করে দেয়। উদারপন্থীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। একদল ভাবতে থাকেন, উত্তর জার্মানির অস্ট্রিয়া-প্রাধান্যের চাইতে দক্ষিণ জার্মানির অস্ট্রিয়া-প্রাধান্য তুলনায় দুর্বল। তাছাড়া সেখানকার ক্যাথলিকরা ফরাসি ক্যাথলিকদের সহানুভূতি পায় বলে অস্ট্রিয়া সেখানে যথেষ্ট কঠোর নয়। তাই দক্ষিণ জার্মানিতে আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তার মাধ্যমেই জার্মান জাতীয় রাষ্ট্র অর্জিত হবে। কিন্তু আর একদল মনে করেন, গণ-আন্দোলনের চাইতেও বেশি জরুরী যে কোনভাবে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রগঠন। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর

জার্মানি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতায় প্রবেশ করে সাংবিধানিক উপায়ে তখন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। প্রথম দলটির সভ্যরা জার্মানিতে পরিচিত হন 'উদারী-গণতান্ত্রিক (Liberal Democrat) হিসেবে, দ্বিতীয় দলের সভ্যরা পরিচিত হন 'উদার জাতীয়তাবাদী' (Liberal National) নামে। এরাই পরে National Liberal party গঠন করেন। এদের দলটিকেই নিজের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিলেন বিসমার্ক। যেহেতু এরাও যে কোন উপায়ে ঐক্যবন্ধ জার্মান রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, তাই বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহে'-র নীতিকে প্রশ্রয় দিতে আপত্তি হয়নি এদের।

৫.১১ বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহ'-নীতির প্রয়োগ এবং জার্মান ঐক্য

উদার-জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিসমার্ক তার রক্ত ও লৌহের নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন। জার্মান জাতীয় সভা তার সমরসজ্জার জন্য অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দে আপত্তি জানানোয় তিনি শুধু উচ্চকক্ষের সম্মতি নিয়ে করস্থাপন করেন। সমরসচিব ভনরুন ও সেনাপতি মল্টকে-র সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যেই প্রাশিয়ার বাহিনীকে ইউরোপের অন্যতম সেরা সমরবাহিনীতে পরিণত করেন। পোল-বিদ্রোহ দমনে রাশিয়াকে সাহায্য করে তিনি রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ইংল্যান্ডের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ফ্রান্সও ততদিনে সম্রাট ততদিনে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের অব্যবস্থিত চিত্ততার জন্য ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্ন। ফলে বিসমার্কের পক্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল অনুকূল। এই অবস্থায় ১৮৬২ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনটি যুদ্ধের সাহায্যে বিসমার্ক জার্মানির ঐক্য সম্পূর্ণ করেন।

বিসমার্কের প্রথম যুদ্ধটি ছিল ডেনমার্কের সঙ্গে। ১৮৬৩ সালে ডেনমার্ক শাসন-সংস্কারের নামে জার্মান অধ্যুষিত শ্লেজহিগ ও হলস্টাইন রাজ্য দুটি সম্পূর্ণ গ্রাস করতে চাইলে বিসমার্ক আপত্তি জানান। এবং এ ব্যাপারে তিনি অস্ট্রিয়ার সমর্থনও আদায় করে নেন। বিসমার্কের আপত্তিকে ডেনমার্ক অগ্রাহ্য করলে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া একযোগে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডেনমার্ক যুদ্ধে হেরে যায় এবং ১৮৬৪-তে ভিয়েনায় এক সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ডেনরাজ নবম খ্রীস্টিয়ান শ্লেজহিগ হলস্টাইনের ওপর সব অধিকার ছেড়ে দেন। ১৮৬৫-র গেস্টিনের চুক্তিতে শ্লেজহিগে প্রাশিয়ার এবং হলস্টাইনে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য স্বীকৃত হয়।

এরপরই বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। অস্ট্রিয়ার হাত থেকে ভেনিসিয়া যাতে ইতালির হাতে যায়, সেই ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে তিনি ইতালিকে দলে টেনে নেন। ১৮৬৬ সালে শ্লেজহিগ-হলস্টাইন প্রশ্নটি অস্ট্রিয়া জার্মান কনফেডারেশনের সভায় উত্থাপন করলে, গেস্টিনের চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে, এই অজুহাতে বিসমার্ক হলস্টাইন আক্রমণ করে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন। সাত সপ্তাহের যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া সাদোয়া-য় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। প্রাগের সন্ধি অনুসারে পুরনো জার্মান কনফেডারেশনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রজোট স্থাপিত হয়। ভিয়েনা-কেন্দ্রিক ইউরোপের রাজনীতি হয়ে ওঠে বার্লিন-কেন্দ্রিক।

প্রাশিয়ার এই উত্থানে ফ্রান্সের কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে। স্বভাবতই উত্তেজিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ফরাসি-সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন। ঠিক এই সময়ে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে প্রাশিয়ার সঙ্গে